

একুশ শতকের শিক্ষার চাহিদা ও টেকসই উন্নয়ন

এস এম রওনক রহমান আনন্দ

একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট, উন্নয়নের ধারা পরিবর্তনশীল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই উন্নয়নের নতুন নতুন ধারাকে রপ্ত করতে হয়। সৃজনশীলতা সেখানে একটা মস্ত বড় ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাই সৃজনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে হয় সর্বাগ্রে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁচতে শেখাই টেকসই উন্নয়নের ভিত মজবুত করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা তাই অপরিহার্য একটি মাধ্যম

হলো—আমরা কী শিখব এবং সেটা কীভাবে? যদি আমরা পরিবেশগত সমস্যার কথা বলি, তাহলে এ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একটা ভূমিকা রাখতে পারে। আর এই ধরনের শিখন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে রপ্ত করতে পারে। কাজেই আমাদের আশপাশের সমস্যা অনুধাবন এবং তার সমাধান সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা। যে শিক্ষা অর্জনে বিদ্যালয় এবং তার শিক্ষকদের ভূমিকা অনন্য। আবারো বলছি, এই উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা চাই যা কিনা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রেষণা প্রদান ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা, ভবিষ্যতের জন্য সার্থক নীলনকশা অঙ্কন, সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি সহজতর হয়ে ওঠে।

তাহলে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন কী করে? এর একটা প্রধান উপায় হলো, গ্রুপে আলোচনার ঝড় তোলা। যখন একজন শিক্ষার্থী একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় একটি

উৎপাদনশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল উপাদানটি হলো মানসম্মত ও সৃজনশীলমূলক শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার ধারায় পরিবর্তন আনয়ন, শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদান, কারিকুলাম তৈরিতে দক্ষতা আনয়নসহ অন্যান্য সব দিক পরিকল্পনার আওতায় আনার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনা যায় যা নিশ্চিত করবে একুশ শতকের শিক্ষার চাহিদা।

তবে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো— তারা কি চলমান উন্নয়নের ধারাকেই অনুসরণ করবে নাকি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারা উন্মোচিত করবে, ভাববে নতুন কিছু? কারণ একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট, উন্নয়নের ধারা পরিবর্তনশীল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই উন্নয়নের নতুন নতুন ধারাকে রপ্ত করতে হয়। সৃজনশীলতা সেখানে একটা মস্ত বড় ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাই সৃজনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে হয় সর্বাগ্রে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁচতে শেখাই টেকসই উন্নয়নের ভিত মজবুত করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা তাই অপরিহার্য একটি মাধ্যম। শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে

মানুষকে তাদের বোধগম্যতার স্তর বাড়িয়ে দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ তথ্য কেবল জানা বা শোনার নয়, বোঝারও। তথ্যকে বিশ্লেষণ করে একটি কার্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে শিক্ষা। শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সেই জ্ঞানকে বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ করাও একটি বড় উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা তথ্য জানবে এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে দেশের একজন আহ্বাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবার মাধ্যমে সমাজে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে, কাক্ষিত গুণগত জীবন অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। নিঃসন্দেহে শিক্ষা টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদের বন্টন সামঞ্জস্যহীন। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটা বড় রকমের বাধা। এই বাধা অতিক্রমের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা বড় অবদান রাখতে পারে। নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষা গ্রহণের হারের মধ্যে সমতা না আনতে পারলে উন্নয়নকে টেকসই করা সম্ভব নয়।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়ন শব্দটির সমার্থক শব্দ উন্নতি, অগ্রগতি তথা পরিবর্তন। কারো মতে, উন্নয়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়ন, কারো কাছে স্বাধীনতা অর্জন। কারো কাছে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা অর্জন। এক-একটি জাতি তার বিদ্যমান অবস্থার আলোকে বেছে নেবে তার কাক্ষিত লক্ষ্য। তবে লক্ষ্যে ভিন্নতা থাকলেও সকল জাতিই উন্নয়নের পক্ষে একমত হবে এটা নিশ্চিত। প্রশ্ন হলো, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা কী? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত ধারা কি টেকসই উন্নয়নের পক্ষে কথা বলে? শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ তৈরি করে, যা ভবিষ্যত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। তবে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের রূপরেখা অনুধাবন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রিটিক্যাল থিংকিং-এর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন যা কিনা ভবিষ্যতে এই উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বলতে বোঝায় শিখন এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্তকরণ। যেমন— আবহাওয়ার পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য নিরসন, সাস্টেইনেবল কনজাম্পশন, বায়োডাইভারসিটি, ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যকার স্ট্র বৈষম্য নিরসন, মানবাধিকার, বিশ্বায়ন, উন্নত জীবন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি।

পৃথিবীর বাস্তবস্থানের ওপর মানুষের চাহিদার চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এই বৃদ্ধির মাত্রা উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশে বেশি। এই বৃদ্ধির বোধ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের থাকতে হয়, থাকা উচিত। কারণ আমরা কোথায় আছি, আমাদের অবস্থান নিয়ে ভাবতে শুরু না করলে এগিয়ে যাবার রাস্তায় পথ হারাতে হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে, বিশেষত পরিবেশ-বিজ্ঞানে এ-জাতীয় ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হলে নিঃসন্দেহে তারা পৃথিবীর বায়োক্যাপাসিটি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করবে। তবে কেবল কারিকুলামে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তকরণ নয়, একই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির অনুসরণ করা দরকার যা কিনা শিক্ষার্থীদের আচরণগত পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে, পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগায়।

একটা মানসম্মত ও যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক ধারণার অনুশীলন লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিখনকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। একটি



নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপরে নিজস্ব মতামতগুলোকে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে তখন উচ্চ বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা শানিত হয়। এক্ষেত্রে সমস্যাভিত্তিক শিখন একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তৈরি হয়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবার ক্ষমতা তৈরিই হতে হবে মূল লক্ষ্য। তাই শিখনের বিষয় এবং পদ্ধতি দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন হবে সমন্বয়; এর মধ্যে সবাই এবং সব আসবে। গবেষকরা সুবিধার জন্য 'সাস্টেইনেবিলিটির চেয়ার' বলে একটি ধারণার প্রচলন করেছেন। এই 'চেয়ার'ের চারটি পায়া আছে এবং নীতি-নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় এই চারটি পায়াকেই সমানভাবে সমন্বয় করতে হবে। কোনো একটি পায়াকে বেশি গুরুত্ব দিলে 'চেয়ার'টা ভারসাম্য হারাতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন অনেকখানিই সুরক্ষিত ও সুস্থ ইকোসিস্টেমের ওপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং মানুষের মানসম্মত জীবনধারণ ও নিরাপত্তার কথা বলে, যার ফলে একটা সাউড ইকোনমিক্যাল অবস্থা অর্জন সম্ভব হয়। তবে টেকসই উন্নয়নকে এভাবে গুটিকতক উন্নয়নমূলক উপাদানের ওপরে নির্ভর করে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। একথা গ্যারান্টি দিয়ে হুয়ত বলা সম্ভব যে, উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে শিক্ষার বড় রকমের অবদান সত্যি অনস্বীকার্য। শিক্ষা মানুষের স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করে মানুষকে সমাজের একজন দায়িত্ববান ও

নিশ্চিত করতে তাই নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। কারিকুলাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর স্ট্রাটাজিকে বিবেচনায় রেখে নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক অবস্থাকে বিবেচনায় আনা; শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে একুশ শতকের চাহিদাকে গুরুত্ব প্রদান; বিষয়বস্তুর নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বয়স ও মেধা যাচাই করা; উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া; পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতিতে ভিন্নতা আনার মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; আদর্শ শিক্ষণ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকসহ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান; একুশ শতকের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা রাখা; শিক্ষকদের ডিজিটাল ক্লাসরুম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া; বাস্তব প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো; হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা বাড়ানো; মূলধারার শিখনের সঙ্গে অন্য ধারার শিক্ষাকেও গুরুত্ব প্রদান; নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান; বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়াসহ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। সেটি আমাদের মতন উন্নয়নশীল দেশের জন্যও সত্য। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। সব

সাধারণত দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ আহরণ করে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটিও একটি বড় রকমের সমস্যা। এই দুই গ্রুপের মানুষদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনাটাও একটা বড় রকমের কাজ। আসলে চিন্তা করলে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, উন্নয়ন চাই— তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা এই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও টেকসই করতে পারে তখন যখন শিক্ষা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিশ্চিত করা হবে, একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত ও নিম্নশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনা হবে। তবে শিক্ষা অর্জনের ধরন আর প্রদানের ধরনে পরিবর্তন আনতে হবে। পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং এ শতকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা মাথায় রেখে শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একটা কথা মাথায় রাখা জরুরি যে, গ্লোবলাইজেশন কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়; অন্যান্য ব্যাপারগুলোর সঙ্গেও জড়িত। এক দেশের মানুষ আরেক দেশে যাচ্ছে। সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটছে। তথ্যের আদান প্রদান ঘটছে। বদলাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। পুরো বিশ্ব আজ মিশ্রিত একাকার। একটি দেশকে তাই সমন্বয় করে তুলবার ক্ষেত্রে শিক্ষার অবদান হবে অনস্বীকার্য। তাই সঠিকভাবে, প্রয়োগমুখী ও জীবনযনিষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হবে।

● লেখক: শিক্ষার্থী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর